দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 21 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

12

পঁচানব্বইয়ের পঞ্চম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা প্রসঙ্গে

মাহমুদুল বাসার

আমার মেয়ে এবার বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে, অভিজ্ঞতা সেই সুবাদে।

এ পরীক্ষাটি শিশুদের প্রথম মেধা যাচাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পরীক্ষাটির বিস্তর উপকারিতাও আছে। একটি শিশুকে যদি পূর্ণ যোগ্য করে তুলতে হয়, তাহলে এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

লেখাপড়া যে জানা ও জ্ঞান অনুশীলনের অন্য নাম, তা মানতে হবে। শিশু শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের বইয়ের নির্দিষ্ট প্রশ্নমালা ধরে সাধারণত প্রস্তুত করানো হয়। কিন্তু বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হলে একটি শিশুকে তার সামর্থ্যের তুলনায় অনেক বেশি প্রস্তুতি নিতে হয় এবং সে প্রস্তুতি শুধু ঘাড় গুঁজে মুখস্থ করার ব্যাপার নয়। রীতিমতো জানার ও অর্জনের ব্যাপার। সবচেয়ে বড় কথা, শিক্ষার্থীর কাণ্ডজ্ঞান মজবুত করার প্রশ্ন আসে প্রথমেই। যে কোন ধরনের প্রশ্ন এলে সে/যেন টাল খেয়ে পড়ে না যায়, যেন কিছু লিখতে পারে, সেই চেষ্টাই থাকে।

নিঃসন্দেহে এ পরীক্ষাটি একটি শিশুকে জানিয়ে দেয় শিখতে হলে, জানতে হলে, জ্ঞান অর্জন করতে হলে ভবিষ্যতে তাকে কতভাবে প্রস্তুত নিতে হবে।

সময়ের মূল্য সম্পর্কে আমরা বাঙালীরা দারুণ উদাসীন। আমাদের শিশুরাও এই প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত। সারা বছর পানির বুদ্বুদের মতো সময়গুলো শিশুরা নষ্ট করে ফেলে, আমরাও নষ্ট করতে দেই। তারপর পরীক্ষার পূর্ব রাতে শিশুর ওপর চাপ সৃষ্টি করি, চোখ লাল করে ধমকাই, "এই, পড় পড়।"

এতে যে ক্ষতি হয় শিশুদের। কিন্তু যারা বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেবে তাদের এমন হলে চলে না। বছরের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে না লাগালে তার বৃত্তি পরীক্ষার হলে যাওয়া বৃথা। অর্থাৎ মুহূর্তগুলোকে বেশ গঠনমূলকভাবে কাজে লাগাতে হয়। এসব প্রসঙ্গ একটি শিশুর হৃদয়ে যখন স্পষ্টভাবে গেঁথে যাবে, তখন তার ভবিষ্যত শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে যাবে। জানবার, শিখবার, অর্জন করবার প্রতি তার নেশা ধরে যাবে। আর জ্ঞানের নেশা কি জিনিস তা তো সৈয়দ মুজতবা আলী 'বইকেনা' প্রবন্ধে বলেছেন। আমাদের শিশুদেরও সেই নেশার সন্ধান দিতে হবে।

বৃত্তি পরীক্ষায় সফল হলে আর্থিক লাভের একটি ব্যাপার আছে। এ ব্যাপারটি স্থূল মনে হয়। আমরা তো শিশুর হাতে নগদ টাকা দেই না, তাতে তারা নিয়মভ্রষ্ট হয়। তাদের দিতে হবে এমন জিনিস যার দ্বারা নির্দোষপ্রক্রিয়ায় উৎসাহিত হবে। বৃত্তি পাওয়ার স্বীকৃতি হিসাবে তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সহজ করে দিতে হবে।

আমার মেয়েকে নিয়ে যখন আমি পরীক্ষার হলে গেলাম, তখন যে দৃশ্য দেখলাম তা আমাকে ব্যথিত করেছে। ঐ পরিবেশ ছিল অনেকটাই শিশুর প্রতিকূল। একটি মেধা পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের জন্য একটি সুন্দর, নিরিবিলি, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ একান্তই কাম্য ছিল। কিন্তু তা ছিল না। এটা আমার কাছে দুঃখজনক ও পীড়াদায়ক মনে হয়েছে।

এ দৃশ্য দেখে মারাত্মক ব্যথিত হলাম যে, অনেকেই নিষ্পাপ শিশুদের নকল সাপ্লাই দিচ্ছে। কী ঘৃণ্য মনোবৃত্তি! কেন নকল সাপ্লাই দেবার প্রয়োজন হলো? ঐ যে ইতর লোভ। মহামতি বুদ্ধ বলেছেন, "লোভ ও মোহ থেকে সমস্ত দুঃখের উৎপত্তি।" সত্যিই তাই। নকল করে শিশুকে বৃত্তি পাওয়াতে হবে? বৃত্তি পেলে প্রতিমাসে কিছু টাকা হয়ত পাওয়া যাবে। এই লোভটুকু আমরা সংবরণ করতে পারি না— দুঃখ এখানেই। লোভের তাড়নায় দুর্নীতির পঙ্কে ঠেলে দিতে দ্বিধা করছে না শিশুদের।

পরীক্ষার হলে দেখলাম, আমলাদের ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমলাদের ছেলেমেয়েদের সুবিধার জন্য কেন্দ্র পরিবর্তন হয়নি। তারা যে স্কুলের ছাত্রছাত্রী, সেই স্কুলেই পরীক্ষা দিতে পেরেছে। কিন্তু অনেক দূরের সমাজের অন্য স্তরের ছেলেমেয়েরা সে সুযোগ পায়নি। নিয়মমাফিক অবশ্যই হোস্ট স্কুলের ছেলেমেয়েরা নিজস্ব স্কুলে পরীক্ষা দিতে পারে না, তারা অন্য কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে। কিন্তু তা হয়নি। পবিত্র, অবুঝ শিশুর ওপর এমন পক্ষপাতিত্ব আমার কাছে চরম অন্যায় বলে মনে হয়েছে।

হোস্ট স্কুলের ছেলেমেয়েদের বিশেষ করে সম্ভাবনাময় মেয়েদের বৃত্তি পাইয়ে দেবার নানা অপকৌশল আমি লক্ষ্য করেছি। আমার মেয়ে বলল, "আব্বু, বাইরে থেকে লোক এসে কোন কোন মেয়েকে প্রশ্নের উত্তর বলে দিয়েছে।" ব্যাপারটা আমি ঠিকই বুঝে নিলাম।

এ তো গেল পারিপার্শ্বিকতার কথা। একই দিনে দুটো পরীক্ষা, এ নিয়ম প্রবর্তন করে শিশুদের ওপর অবিচার করা হয়েছে। এ নিয়ম রহিত করা উচিত। তাও আবার 'ইংরেজী' ও 'পরিবেশ পরিচিতি' একই দিনে নেয়া হয়েছে। পরিবেশ পরিচিতিতে আছে পরিবেশ ও বিজ্ঞান। এতে দাঁড়াল একই দিনে তিনটি পরীক্ষা। এতে শিশুরা নাস্তানাবুদ হয়ে গেছে। কতটুকুই বা ওদের ধারণ ক্ষমতা!

তিন থেকে পাঁচ মাইল দূর থেকে হেঁটে আসা একটি শিশুর ক্ষেত্রে কতটা যে অবিচার হয়, তা কি কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখছেন?

প্রতিদিন পর পর একটি করে পরীক্ষা হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না। তাই কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটা ভেবে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।